ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ১০ পণ্য

রপ্তানির সুযোগ হাজার কোটি টাকা

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের এই খাতটি সব সময় হয়েছে অবহেলিত কিন্তু এই শিল্প পণ্যগুলো দেশের অর্থনৈতিক চিত্র বদলে দিতে পারে...

লিখেছেন **পারভীন তানি ও সোনিয়া হাওলাদার**

মুক্তবাজার অর্থনীতি এখন সমগ্র বিশ্বের বাজার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। দেখা যায়, যেসব দেশ কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্য একচেটিয়া বাজার দখল করে আছে, মুক্তবাজার ব্যবস্থার কারণে সেখানে অংশীদার হচ্ছে অন্য একটি দেশ। এখানে চলছে প্রতিযোগিতা। এটা বিশ্বায়নের ফলাফল। বিশ্বায়নের ফলে মানুষ কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য নির্দিষ্ট দেশের ওপর নির্ভরশীল নয়। বাংলাদেশও এই বিশ্বায়নের বাইরে নয়। ফলে যেখানে বাংলাদেশ পাট, চা, চামড়া শিল্প দিয়েই বেশির ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতো, সেখানে এখন এসব পণ্য বিশ্ব বাজারে মুখোমুখি হয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতার। অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে ফেলেছে বাজার। এর জন্য শুধু যে বিশ্বায়ন বা মুক্তবাজার ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায় তা নয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোও বাজার হারানোর জন্য দায়ী।

বাংলাদেশের রপ্তানির এ অবস্থায় সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে বেশ কিছু পণ্য। যেগুলো সৃষ্টি করছে নতুন রপ্তানি খাতের। অর্জন করতে পারে বৈদেশিক মুদ্রা। একই সঙ্গে বলা যায়, এসব পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের খরচ খুবই কম। অন্যদিকে বিদেশের বাজারে রয়েছে এর ব্যাপক চাহিদা।

কেননা, রপ্তানি ক্ষেত্রে পণ্যগুলোতে তেমন কোনো প্রতিযোগিতা নেই। চা, পাটের মতো বৃহৎ শিল্পে বাংলাদেশ যেখানে নাজুক অবস্থায় রয়েছে, সেখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বাংলাদেশ এই সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কাটিয়ে উঠতে পারবে। প্রয়োজন শুধু সরকারের সদিচ্ছা।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদনে যেসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পণ্য স্থান পেয়েছে, যেগুলো ইতিমধ্যে বিশ্ববাজারে চাহিদা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে অথবা কিছুদিনের মধ্যে তা দেশের রপ্তানি পণ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

শতরঞ্জি : রয়েছে ৫০ কোটি টাকার বাজার

হারিয়ে যাওয়া একটি পণ্য শতরঞ্জি। এক সময় শতরঞ্জির ছিল ব্যাপক প্রচলন। দড়ি দিয়ে তৈরি এই পণ্যটি দাদী-নানীরা ব্যবহার করতো বিভিন্ন কাজে। কিন্তু কালক্রমে এটি হারিয়ে যায়। গত কয়েক বছর ধরে শতরঞ্জি আবার আমাদের ব্যবহারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। নতুন শতাব্দীতে জনপ্রিয়তা পায় শতরঞ্জি। বিভিন্ন মেলা, প্রদর্শনী তা প্রমাণ করে। তবে এই শতরঞ্জি যে শুধু দেশের মানুষের মধ্যেই চাহিদা সৃষ্টি করেছে তা নয়, বাইরের দেশগুলোতে এর চাহিদা প্রচুর।

দেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান একেবারে ক্ষুদ্র পরিসরে ইউরোপের কয়েকটি দেশে শতরঞ্জি রপ্তানি করছে। এসব বাজারে বাংলাদেশের তৈরি শতরঞ্জির চাহিদা বাড়ছে ব্যাপক হারে। বিদেশের বাজারে যে চাহিদা রয়েছে এ দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো তার ১০%ও সরবরাহ করতে পারছে না। ব্যবসায়ীরা ধারণা করছেন, এসব অর্ডার সরবরাহ করতে পারলে বাংলাদেশ শুধু শতরঞ্জি রপ্তানি করে প্রতি বছর আয় করতে পারবে প্রায় ৫০ কোটি টাকা।

এমনই একটি শতরঞ্জি রপ্তানি প্রতিষ্ঠান কারুপণ্য। প্রতিষ্ঠানটির মার্কেটিং ম্যানেজার আলমগীর লিবলু সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'শতরঞ্জির মূল উপকরণ সুতা। সুতার ধরনের ওপর নির্ভর করে শতরঞ্জি তৈরি করা হয়। কটন, এক্রিলিক ও পাট- এই তিন ধরনের সুতা দিয়ে শতরঞ্জি তৈরি হয়। বাংলাদেশের রংপুরে তৈরি হচ্ছে শতরঞ্জি।'

২০০৪ সালে কারুপণ্য জাপানের হোন্ডা মোটরস কোম্পানিকে তাদের তৈরি শতরঞ্জি উপহার দেয়। মূলত এখান থেকেই শতরঞ্জি রপ্তানি বাজারে পা রাখে। এখন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও স্পেনে এটা রপ্তানি করা হচ্ছে। রপ্তানির অপেক্ষায় আছে জার্মানি ও সুইডেনে।

তবে রপ্তানিতে কিছু সমস্যা আছে বলে সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান আলমগীর লিবলু। তিনি বলেন, প্রথমেই আমাদের যে সমস্যায় পড়তে হয় তা হলো সুতা। শতরঞ্জির মূল কাঁচামাল সুতা। আমাদের দেশে এক সময় প্রচুর পাট ছিল। কিন্তু সেই পাট এখন নেই। অথচ শতরঞ্জি তৈরিতে পাটের সুতা ব্যবহার করতে হয়। সুতা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় বলে খরচ বেশি পড়ে। অন্যদিকে এক্রিলিকে যে সুতটা ইপিজেড থেকে আসে সেটার মানও খুব ভালো থাকে না। আলমগীর লিবলু সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'কাঁচামালের সমস্যার কারণে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী রপ্তানি করতে পারছি না। কাঁচামাল, পোর্টে মাল ছাড়ানো সমস্যা, কাগজপত্রের সমস্যার কারণে বায়ারদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। বায়ারদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য রপ্তানি করতে পারছি না। এমনও হয়েছে,

mZvi Af\‡e fM‡Q kZiwÄi evRvi

এক সপ্তাহে ২ কন্টেইনার মাল চাচ্ছে। কিন্তু দিতে পারছি না। এসব সমস্যার কারণে আমরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রপ্তানি প্রক্রিয়া ধীরগতিতে করছি।'

ইউরোপীয়দের আকর্ষণ এ দেশের গহনা

হাজারীবাগের ফাল্গুনী সব সময়ই পছন্দ করে মাটি, কাঠ, পাটের গহনা। সে নিজে যেমন পড়তে পছন্দ করতো তেমনি পছন্দ করতো অন্যকে উপহার দিতে। গহনা কিনতে কিনতে সে আগ্রহী হয় নিজে বানাতে। রুমের এক কোনায় তৈরি করে তার ছোট্ট কারখানা। ফাল্গুনীর খালাতো বোন লিসা। সুইডেন প্রবাসী লিসা বাংলাদেশে এলে সে তাকে পাট ও পুঁতির একসেট গহনা উপহার দেয়। লিসা তার বান্ধবীদের জন্য নিয়ে যায় আরো কয়েক সেট গহনা। সুইডেনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এসব গহনা। ব্যক্তিগতভাবে ফাল্গুনী বেশ কিছু পাট, পুঁতির গহনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইডেনে পাঠায়। কিন্তু সহযোগিতা, পুঁজি ইত্যাদি কারণে তার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা অচিরেই হারিয়ে যায়।

শুধু আমেরিকা বা সুইডেন নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে হাতের তৈরি এই গহনার চাহিদা অনেক। একটু অন্যরকম, ভিন্ন নকশার এসব গহনা দিয়ে বাংলাদেশ সহজেই দখল করে নিতে পারে বিভিন্ন দেশের বাজার। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সূত্র থেকে জানা যায়, ২০০১-০২ অর্থবছরে যেখানে রপ্তানি হয় মাত্র ১৪ হাজার টাকার গহনা, সেখানে ২০০২-০৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পায় ১১ লাখ ২০ হাজার টাকায়। এটা বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক দিক।

এসব হাতে তৈরি গহনার পাশাপাশি বাংলাদেশে তৈরি 'শেলের' গহনাও ধীরে ধীরে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করছে। শেলের তৈরি গহনার বয়স বাংলাদেশে খুব বেশি নয়। তবে এরই মধ্যে বাংলাদেশের শেলের গহনা বিশ্ববাজারে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

'শেল' হচ্ছে রঙিন ঝিনুকের খোল। এটা মূলত পাওয়া যায় হংকং ও নিউজিল্যান্ডে। গোলাপি ও নীলের সংমিশ্রণের এই শেল দিয়ে কানের দুল, গলার লকেট, হাতের ব্রেসলেট, আংটি তৈরি হয়। বিশ্ববাজারে শেল গহনার বাজার দখল করে আছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া। প্রায় ৯০ ভাগ গহনা রপ্তানি করছে দক্ষিণ কোরিয়া। সেখানে বাংলাদেশের জন্য বাজার পাওয়া কষ্টকর। তবে আশার কথা হলো, বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাগুলোতে বাংলাদেশ শেল গহনার প্রচুর অর্ডার পাচ্ছে। 'শেল ডিজাইন'-এর মালিক বজলুর রহমান বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে জার্মানি ও স্কটল্যান্ডে এ ধরনের গহনা রপ্তানি করছেন। শেল ডিজাইন ২০০০ সালে লন্ডনে একটি মেলার মাধ্যমে রপ্তানির সুযোগ পায়। বজলুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'জার্মানিতে শেল গহনা রপ্তানি করে ২০০৪ সালে, আয় হয় প্রায় ২৫ হাজার ইউরো। অন্যদিকে স্কটল্যান্ডে রপ্তানি করে ৩৫ হাজার ডলারের শেল পণ্য। তবে এই রপ্তানি আয় আরো বাড়বে, যদি অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার সমাধান করা হয় এবং সরকারি সহায়তা পাওয়া যায়।

gv‡bi w`K †_‡K Gme 0‡kj©-Gi Mnbv LeB fv‡jv

শো-পিস বিশ্ববাজারে তৈরি করতে পারে আলাদা রপ্তানি ক্ষেত্র

বাংলাদেশের শো-পিসগুলো ততটা আধুনিক নয়। কিন্তু এসব পণ্যের বিশ্ববাজারে রয়েছে ভিন্ন একটি গ্রহণযোগ্যতা। হাতে তৈরি এসব পণ্য উন্নত বিশ্বের মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। বাংলাদেশ থেকে হাতের তৈরি বিভিন্ন শো-পিস বেশ কয়েক বছর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকার দেশগুলোতে রপ্তানি হচ্ছে।

সেই হিসাবে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশ শুধু এসব পণ্য রপ্তানি করেই আয় করতে পারবে বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পণ্যের ব্যাপক চাহিদা। বাংলাদেশে শো-পিসগুলো তৈরি হয় মূলত বাঁশ, বেত, পাটি, কাঠ, নারিকেলের খোসা, দড়ি, কাগজ ইত্যাদি দিয়ে। এর মধ্যে বাঁশ দিয়ে সোফা, ফুলদানি, লাইট শেড, টিস্যু বক্স, টিভি স্ট্যান্ড ইত্যাদি তৈরি হয়। বেতের উপকরণের মধ্যে আছে ফটোফ্রেম, সোফা, আয়নার ফ্রেম ইত্যাদি। পাটির মধ্যে আছে অ্যালবামের ঢাকনা, জুয়েলারি বক্স, ব্যাগ ও শীতল পাটি। বাঁশ, বেত, পাটি শিল্প লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী আনোয়ারা সিদ্দিকা সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানান, 'আমাদের পণ্যের কাঁচামাল আসে চট্টগ্রাম, গাজীপুর, পঞ্চগড় থেকে। এগুলো আমরা পরিশোধিত করে তারপর পণ্য তৈরি করি। ফলে এর গুণগত মান হয় ভালো। বিভিন্ন মেলায় আমরা অর্ডার পেয়ে থাকি। কিন্তু এখনো আমরা রপ্তানির বিশালতার মধ্যে যেতে পারিনি। এছাড়াও চাবির রিং, নকশি করা ছোট ব্যাগ, কাঠের চামচ, মোমবাতি ইত্যাদি দু-একটি কোম্পানি রপ্তানি করলেও বেশির ভাগই রয়ে গেছে আড়ালে।

প্রসাধনসামগ্রী : পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রসাধনসামগ্রীর জয়জয়কার। সেখানে বাংলাদেশের জন্য বিশ্ববাজার ধরা কষ্টকর। তবে কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে বাংলাদেশী প্রসাধনসামগ্রীর চাহিদা আছে। যেমন- মধ্যপ্রাচ্য, ভুটান, সিঙ্গাপুর, কেনিয়া, নাইরোবি, লন্ডন, জার্মান, কানাডা ইত্যাদি। আশার কথা হলো, ২০০১-০২ অর্থবছরের তুলনায় ২০০২-০৩-এ রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে রপ্তানি হয় ৮৪ লাখ ৫৪ হাজার টাকার প্রসাধনসামগ্রী।

প্রসাধনসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ২টি ধরন। সাধারণ ও ভেষজ। সাধারণের মধ্যে কিউট, এরোমেটিক ইত্যাদি কোম্পানি অনেক আগে থেকেই রপ্তানি করছে। সাধারণ প্রসাধনসামগ্রীর মূল রপ্তানি ক্ষেত্র হলো মধ্যপ্রাচ্য, ভুটান, মালয়েশিয়া ইত্যাদি। বর্তমানে তেল, ক্রিম, আফটার শেভ লোশন, পাউডার, শ্যাম্পু, বডি লোশন, ক্লিনজিং, মিল্ক, সানব্লক ইত্যাদি রপ্তানি হয়। মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমেদ সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানান, 'আমরা '৮৬ সাল থেকে কিউটের প্রসাধনসামগ্রী রপ্তানি করছি। ওমান ও দুবাই আমাদের নিয়মিত বায়ার। আমরা আমাদের গুণগত মান দিয়ে এখনো বাজার ধরে রেখেছি। তবে প্রসাধনসামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে এখনো কিছু সমস্যা হচ্ছে, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমাধান সম্ভব না। সরকারি সাহায্য প্রয়োজন।'

বাংলাদেশী হারবাল পণ্যের বিশাল বাজার রয়েছে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে। এখানে সমস্যা দুটি। এক. হারবাল পণ্যের বাজারে প্রতিযোগী কম থাকলেও চাহিদা তীব্র। চীন হারবাল পণ্যের বাজার দখল করে আছে। অন্য সমস্যাটি হলো, কাঁচামাল বিদেশ থেকে আসে বলে উৎপাদন খরচ বেশি হয়ে যায়। লিজান হারবালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুল হক সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানান, 'প্রতিযোগিতা থাকলেও পণ্যের মান আমাদের জন্য বাজার সৃষ্টি করছে। গুণগত মান যদি ভালো থাকে তবে ভয়ের কিছু নেই।' হারবাল পণ্যের মধ্যে মেহেদী হেনা, শ্যাম্পু, তেল, নিম সাবান, ম্যাসাজ ক্রিম, উপটান এগুলো রপ্তানি হচ্ছে।

হোম টেক্সটাইল: সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত

বাংলাদেশে নতুন হলেও একেবারে পিছিয়ে নেই মাঝারি শিল্প হোম টেক্সটাইল। সোফার কভার, কুশন, টেবিল ম্যাট ও ন্যাপকিন, বিছানার চাদর, এপ্রোন, পর্দার লক ইত্যাদি হোম টেক্সটাইল পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এ দেশের অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রপ্তানি প্রক্রিয়ায় জড়িত। কারুপণ্যের মার্কেটিং ম্যানেজার আলমগীর লিবলু সাপ্তাহিক

ইউরোপ আমেরিকায় রয়েছে মধু'র বাজার

বর্তমানে মধুর গুরুত্ব অনেক। মধু যেমন ব্যবহার হয় খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ বাড়াতে, তেমনি ওষুধ তৈরিতে রয়েছে এর প্রয়োজনীয়তা। প্রসাধন সামগ্রীতেও মধু গুরুত্বপূর্ণ। এই উপলব্ধি থেকে নেপাল মধুকে তার রপ্তানি খাতে যোগ করেছে। মধু বিভিন্ন খাদ্যে ব্যবহার করে এর জনপ্রিয়তা আরো বাড়িয়েছে নেপাল। ইংল্যান্ড, কোরিয়া, জার্মানি, জাপান, হংকং, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশে নেপাল মধু রপ্তানি করছে।

বাংলাদেশও অনুসরণ করতে পারে নেপালের পথ। কারণ বাংলাদেশ মধু চাষের জন্য খুবই উপযোগী। মধুর জন্য যে অবকাঠামো প্রয়োজন তাহলো সারা বছর মাঠভর্তি বিভিন্ন ধরনের শস্য। বাংলাদেশের মাঠে প্রায় সারা বছরই শস্য থাকে। আছে বিশাল সুন্দরবন, যেখান থেকে সহজেই মধু আহরণ সম্ভব। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ফলের মধু। এ ছাড়া আমাদের দেশে আবহাওয়া মধু উৎপাদনে সহায়ক। শীতের দেশগুলোতে যেখানে বছরে ৩ মাস মাত্র মধু পাওয়া যায়, সেখানে বাংলাদেশে ৭/৮ মাস মধু উৎপাদনে সহায়ক। এখানে শ্রমিকও সহজলভ্য।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রশিকা মধু উৎপাদন করছে ব্যাপক পরিমাণে। প্রশিকার রয়েছে ৭টি মৌমাছির খামার। প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর আবদুল আলীম ভুঁইয়া সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'আমাদের গড়ে প্রতি বক্স থেকে যেখানে ৬০ কেজি মধু উৎপাদন হয়, সেখানে হাজার হাজার টন মধু উৎপাদন কোনো ব্যাপার না। আমরা এ মুহূর্তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রপ্তানি করতে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমরা বায়ার খুঁজে পাচ্ছি না।'

মধুর জন্য আমাদের সবকিছুই আছে। মধুর উৎস, শ্রমিক, আবহাওয়া। এমনকি মধু উৎপাদনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেয়া হয়ে থাকে। যদি এ খাতে রপ্তানি করা যায় তবে এর সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল এবং মানুষও আগ্রহী হবে মধু উৎপাদনে।

বর্তমান বিশ্ববাজারে মধুর বাজার দখল করে আছে কানাডা। কানাডার মূল বাজার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কানাডা তার মোট রপ্তানির ৫০ থেকে ৮০ ভাগ মধু যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। এছাড়াও ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্যে মধু রপ্তানি করে কানাডা। কানাডা ছাড়াও মধু উৎপাদন করে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, চীন। বর্তমানে বিশ্বে মধু উৎপাদন হয় প্রায় ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

AvaibK c×wZ‡Z gvQ ïK‡bvi c×wZi D™¢veK mvbwW A¨v‡cwUU

২০০০কে জানান, 'বাংলাদেশের জন্য হোম টেক্সটাইল সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত। প্রতি বছরই আমাদের রপ্তানি আয় বাড়ছে। এর কারণ এসব পণ্যের কাঁচামাল দেশীয় বলে সহজলভ্য। তাই যদি এই পণ্যে প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় তবে শুধু এই খাত থেকে বাংলাদেশ রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জন করতে পারবে।' হোম টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তৈরি করে একেবারে নিজস্ব ধাঁচের পণ্য, যা অন্য দেশগুলোকে পণ্য আমদানিতে আকৃষ্ট করে। যেমন- কুশন কভারের নকশার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যবহার করছে দেশীয় মোটিফ। তৈরি করছে কাপড়, বাঁশ, বেতের পর্দার লক। এ ধরনের পণ্যের প্রতি বিদেশীদের আগ্রহ বাড়ছে। কারণ ২০০১-০২ অর্থবছরের তুলনায় ২০০২-০৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে এসব পণ্যের আমদানিকারক দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সূত্র থেকে জানা যায়, ২০০২-০৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ৪১৩ কোটি টাকার এসব পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশ হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি করছে প্রায় ৫০টি দেশে। যার মধ্যে শীর্ষে আছে ইংল্যান্ড, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে। মূলত আমেরিকা ও ইউরোপই বাংলাদেশের মূল বাজার। তবে এশিয়াতেও বাংলাদেশের বাজার ভালো।

শুঁটকি : রপ্তানি সহায়ক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন

মুখরোচক শুঁটকির প্রতি সবারই কমবেশি আগ্রহ থাকে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মাছি, পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রায় সব শুঁটকিতেই বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এসব কীটনাশকযুক্ত শুঁটকি খেলে কয়েক বছরের মধ্যে মানুষের কিডনি, লিভার ও পাকস্থলীর বিভিন্ন মারাত্মক রোগ, ক্যান্সারে মৃত্যুও হতে পারে। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য আইনে শুঁটকিতে কীটনাশক ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ।

এসব সমস্যার কথা চিন্তা করে সম্প্রতি কমিউনিটি কমিউনিকেশন্স কক্সবাজারে মৎস্য

জামদানি, সিল্ক শাড়ি

অভ্যন্তরীণ সমস্যায় বাজার হারাচ্ছে ১০০ কোটি টাকার

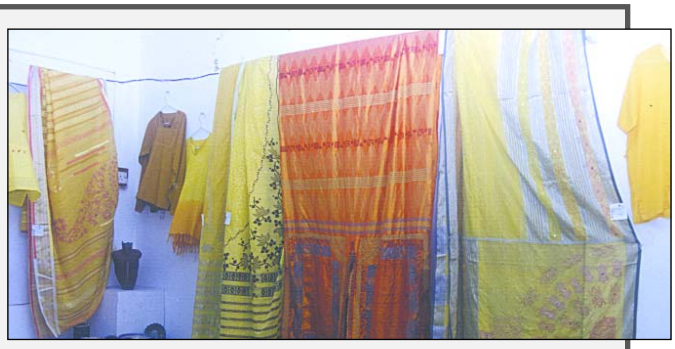

জামদানি শাড়ির জনপ্রিয়তা এখন দেশ ছাপিয়ে ভারত, শ্রীলঙ্কা, মধ্যপ্রাচ্য, লন্ডন, আমেরিকাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। এসব দেশে এ শাড়ির চাহিদা রয়েছে এবং তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এসব পণ্যের মূল ক্রেতা হলো দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসীরা। ভারতে ভালো জামদানি শাড়ি তৈরি না হলেও মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকার বাজারে তারা একাই ব্যবসা করে চলছে। সিল্ক কাপড়ের ক্ষেত্রে তাদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী চীন। বাংলাদেশের পণ্যের গুণগতমান ভালো, তারপরও বাংলাদেশের অবস্থান একেবারেই নগণ্য।

শাড়ি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সুতা, জরি, রেশম সব কিছুই আমাদের দেশে উৎপাদন হয়। বিদেশের বাজারে এ দেশের জামদানি শাড়ির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কিন্তু উৎপাদন কম হওয়ায় আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ শাড়ি বিদেশে পাঠাতে পারছি না। এ বিষয়ে ঢাকাই জামদানির মালিক মোঃ হামিদুল্লাহ জানান, 'এই ব্যবসা করতে এসে তিনি কোনো সরকারি লোন পাননি। সরকার যে লোন দেয় তা প্রথম সারির দিকে অবস্থানরত কিছু ব্যবসায়ী পেয়ে থাকে। ছোট ব্যবসায়ীদের হাতে এসে পৌঁছায় না। পুঁজির অভাব থাকায় অনেক ব্যবসায়ী এ বাণিজ্যে আসতে সাহস পান না।

তিনি আরো জানান, উইভিং এসোসিয়েশন কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্তর্কলহ থাকায় তারা রপ্তানির বিষয়ে আলোচনা এবং সরকারকে তাদের সমস্যা সম্পর্কে জানাতে পারছে না।

ভারতের কোলকাতায় জামদানি শাড়ির একটি শো-রুম খোলার কথা থাকলেও এর কাজ অনেক দিন ধরেই স্থগিত রয়েছে। সরকার আগে জামদানি শাড়ি রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা দিত, কিন্তু এখন তা বন্ধ করে দেয়ায় রপ্তানি অনেক কমে গেছে।

২০০২-০৩ সালে প্রায় ১৮ লাখ টাকার জামদানি শাড়ি রপ্তানি করা হয়। জামদানি শাড়ির দক্ষ কারিগর শুধু বাংলাদেশেই আছে, যা বিশ্বের আর কোনো দেশে নেই। এ ছাড়া সরকারের উচিত ছোট ব্যবসায়ী যারা সরাসরি জামদানি রপ্তানি করতে পারছে না তাদের অনুপ্রাণিত করা। ছোট ব্যবসায়ীরা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে। তখন বিদেশী ও প্রবাসী বাঙালিরা তাদের প্রয়োজনমতো শাড়ি নিয়ে যায়। মূলত সরকারি সহযোগিতা এবং উইভিং এসোসিয়েশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জামদানি শাড়ির রপ্তানি ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা যায়।

বাংলাদেশ রেশম শিল্পে একসময় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। রাজশাহীকে বলা হতো রেশম পল্লী। এসব সিল্ক শাড়ির গুণগত মান ছিল অনেক উন্নত এবং রপ্তানিযোগী। হানিফ সিল্কের মালিক মোঃ হানিফ সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, তারা ১৯৯৭ সাল থেকে দুবাই, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রে সিল্ক শাড়ি রপ্তানি করছেন।

২০০২-০৩ সালে বাংলাদেশ থেকে ৪ লাখ ৫৭ হাজার টাকার সিল্ক শাড়ি রপ্তানি করা হয়, যা ২০০১-০২ সালের রপ্তানির তুলনায় প্রায় ৪ গুণ কম। এর কারণ হিসেবে দেখা যায়, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে মাত্র ৩৬ হাজার টাকা দেয়া হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ব্যবসায়ীদের পুঁজির অভাব, লোকবল কম, সরকারি আর্থিক সহায়তা পাবার ক্ষেত্রে রয়েছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দলীয়করণের প্রভাব। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করে, এসব সমস্যার সমাধান হলে বিশ্ববাজারে জামদানি ও সিল্ক শাড়ি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতি বছর শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারবে।

অধিদপ্তর এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কারিগরি সহায়তায় মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন দ্বারা আধুনিক সৌরতাপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ কীটনাশকমুক্ত শুঁটকি উৎপাদন শুরু করেছে। প্রতিষ্ঠানটির নাম সানড্রি অ্যাপেটিট। ২০০৪ সালে এদের যাত্রা শুরু।

উৎকৃষ্টমানের তাজা মাছ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সোলার ড্রায়ারের মাধ্যমে শুকানো হয়। সোলার ড্রায়ার পরিবেশবান্ধব একটি প্রযুক্তি, যেখানে সূর্যালোক থেকে পর্যাপ্ত তাপ সৃষ্টি করে দ্রুত মাছ শুকাতে সাহায্য করে। লম্বা মাচার ওপর স্থাপিত একটি টানেলে স্বচ্ছ মোটা পলিথিন দিয়ে মুড়ে লবণ ছাড়া মাছ শুকানোর জন্য সোলার ড্রায়ার তৈরি করা হয়। উচ্চতাপ ও বাতাসের মিলিত প্রভাবে মাছ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এই শুকানোর কাজটি রাতে করা হয় মাছির উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য। ঢাকা থাকে বলে শুঁটকি ধুলোবালি ও ব্যাক্টেরিয়ামুক্ত থাকে।

সোলার ড্রায়ার পদ্ধতিতে শুঁটকি প্রস্তুত করা হলে তা স্বাস্থ্যসম্মত হয় কিন্তু এর কিছু সমস্যাও রয়েছে। তাজা মাছ ব্যবহার করতে হয় বলে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় সোলার ড্রায়ার পদ্ধতিতে খরচ বেশি পড়ে। লবণ ব্যবহার হয় বলে প্রচলিত পদ্ধতিতে ৪-৫ কেজি মাছ থেকে ১ কেজি শুঁটকি প্রস্তুত হয়। অন্যদিকে সানড্রি ৭-৮ কেজি মাছ থেকে ১ কেজি শুঁটকি প্রস্তুত করতে পারে। প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় সোলার ড্রায়ার পদ্ধতিতে সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, তাই শ্রমিকের মজুরি অনেক বেশি।

প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী রেজাউল ইসলাম কল্লোল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, এই শুঁটকির বৈদেশিক বাণিজ্যে রয়েছে বিশাল সুযোগ। নতুন কোম্পানি হিসেবে এফবিসিসিআই আয়োজিত এসএমই মেলা ২০০৫-এ অংশগ্রহণ করে আমাদের প্রতিষ্ঠান দেশী-বিদেশী ক্রেতাদের কাছে বিপুল সাড়া পেয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন সুপারশপ ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে আমাদের পণ্য পাওয়া যাবে।

তিনি আরো বলেন, এখন পর্যন্ত কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, লন্ডন ও আমেরিকায় সোলার ড্রায়ার পদ্ধতিতে নির্মিত শুঁটকির নমুনা পাঠানো হয়েছে।

শুঁটকির বাজার মূলত বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের জন্য। প্রতি বছরই বিপুল পরিমাণ শুঁটকি বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। আশা করা যায়, এই নতুন পদ্ধতিতে শুঁটকিকরণ রপ্তানি আয় আরো বাড়াবে।

বিভিন্ন খাদ্যপণ্য : রপ্তানি আয় বাড়ছে প্রতি বছর

একটা সময় ছিল যখন বিভিন্ন খাদ্যপণ্য আমদানি করা হতো। কারণ বাংলাদেশ তখন উন্নত খাদ্যপণ্য তৈরি করতে পারতো না। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ মানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য তৈরি করছে, যা দেশীয় চাহিদা পূরণ করে এখন রপ্তানি করা হচ্ছে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে জ্যাম, জেলী, আচার, মসলা, আলু, জুস, চানাচুর, ক্যাচাপ, লাচ্ছা, সেমাই, সিরাপ প্রভৃতি। এর মধ্যে ২০০২-০৩ অর্থবছরে শুধু জ্যাম-জেলি রপ্তানি করা হয় প্রায় ৪ লাখ টাকার এবং আলু রপ্তানি হয় সোয়া ১ কোটি টাকার।

ইজাব গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার অনুপ কুমার সাহা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, তারা ২০০৪-এর জানুয়ারি মাস থেকে বিভিন্ন আচার, মসলা, আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রপ্তানি করছেন।

এসব পণ্য দুবাই, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়ায় পাঠানো হয়। তবে যেখানে প্রবাসী বাঙালিদের অবস্থান বেশি সেখানকার বাজার ধরাই মূল লক্ষ্য।

অনুপ কুমার সাহা আরো বলেন, এসব পণ্যের গুণগত মান অনেক উন্নত এবং বিদেশে চাহিদাও রয়েছে অনেক বেশি। কিন্তু উপযুক্ত সরকারি সহায়তার অভাবে প্রচুর পরিমাণে পণ্য রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে না। সরকার কৃষি পণ্যের জন্য ৩০%-এর বেশি আর্থিক সহায়তা দেয় না। এ কারণে পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া পুরো একটি কন্টেইনার ভরে পণ্য পাঠানোর মতো সামর্থ্য এখনো হয়নি কোনো কোম্পানির। তাই সরকারি কন্টেইনার থাকলে তা বুকিং দিয়ে যে যার মতো মাল পাঠাতে পারতো।

অন্যদিকে কাজলী ফুড প্রোডাক্টস বাজারে নিয়ে এসেছে খেজুর রসা (সিরাপ)। মাগুরা জেলার কাজলী গ্রামে একটি প্রজেক্ট নেয়া হয়। খেজুর গাছের রস কমে যাচ্ছে এবং তাদের লাভ না হওয়ায় খেজুর গাছ ইটের ভাটায় বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে। মূলত খেজুর গাছ রক্ষার উদ্দেশ্যেই খেজুর রসা (সিরাপ) তৈরি। প্রথমে ঢাকায় বাজারজাত করা হয়। ২০০৪ সাল থেকে খেজুর রসা মধ্যপ্রাচ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হচ্ছে। এর রপ্তানি বাজার আরো প্রসারিত করাই এদের লক্ষ্য।

c-w÷K cY¨ G †`‡ki ißwb †¶‡Î bZb w`MšÍ

প্লাস্টিক পণ্য : প্রয়োজন কাঁচামাল তৈরির কারখানা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি বিষয়ে বারবার আলোচনা ও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন সরকারি সহায়তা পাওয়া যায়নি। বলতে গেলে আমাদের অগোচরে এ শিল্পটি বেড়ে উঠেছে।

প্রতি বছর প্রায় ৬০০ কোটি টাকার প্লাস্টিক পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। তাছাড়া দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় প্রায় ৮০০ কোটি টাকার পণ্য। গুণগতমানের কারণে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী পণ্যের রয়েছে বিপুল চাহিদা। ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কিছু দেশে এ পণ্য রপ্তানি করা হয়। এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে গাজী, বেঙ্গল, প্যাসিফিক, পলিশাওয়ান, বারী, এস্টেপস, পলি প্লাস্টসহ প্রায় ২৫০টি কোম্পানি।

প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে রয়েছে নানা অন্তরায়। এ পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয় জার্মানি, কোরিয়া ও ভারত থেকে। প্লাস্টিক পণ্যের মূল উপাদান পলিভিনিল ক্লোরাইড, পলিপ্রোপাইলিন এবং পলিথিলিন আমদানি করতে মোট ৪২% শুল্ক ও কর দিতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে ১৫% আমদানি শুল্ক, ১৫% ভ্যাট, ৪% উন্নয়ন সারচার্জ এবং ৩% অগ্রিম আয়কর। সাধারণত প্রতি টনে ২৭ হাজার টাকা কর দিতে হয়।

বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্যের প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের (বিপিজিএমই) সভাপতি মোঃ ইউসুফ আশরাফ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'দেশে প্লাস্টিক পণ্যের কাঁচামালের 'মোল্ড' ইন্ডাস্ট্রি খোলার বিষয়ে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। এতে কাঁচামাল আমদানি হ্রাস পাবে এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।'

পণ্য উৎপাদনের পর আবার দেখা দেয় সমস্যা। যেমন কাঁচামাল ও প্রস্তুতকৃত মালের ক্ষেত্রে করের ব্যবধান মাত্র ১৫%। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদি ৭.৫% কর ধার্য করা হয় তবে প্লাস্টিক পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানো যাবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা।

ছবি : সালাহউদ্দিন টিটু